দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ভাল স্কুলের সংখ্যা আট শতাংশের কম

সৃজনশীল বোঝেন না ৫৪ শতাংশ শিক্ষক

বিভাষ বাড়ৈ ॥ দেশে 'খুব ভাল' মানের স্কুলের সংখ্যা আট শতাংশেও কম! এক বছরের খুব ভাল স্কুলের সংখ্যা বাড়লেও সেই সংখ্যা এখনও দুই অংকের কোটায়ও পৌঁছায়নি। খোদ সরকারের এক মূল্যায়ন প্রতিবেদন বলছে, খুব ভাল মানের অর্থাৎ 'এ' ক্যাটাগরির স্কুলের সংখ্যা সাত দশমিক ৩২ শতাংশ। আগের বছর ছিল পাঁচ দশমিক ৫৪ শতাংশ। অন্যদিকে 'বি' ক্যাটাগরির মোটামুটি ভাল স্কুলের সংখ্যা এক বছরে ৪৯ দশমিক ৩৮ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে হয়েছে ৪৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এছাড়া 'ডি' ক্যাটাগরির দুর্বল ও 'ই' ক্যাটাগরির অকার্যকর স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৮ শতাংশ। এছাড়া পাহাড়ী এলাকার প্রায় আট শতাংশ স্কুল চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। হাওড় এলাকার ছয়, উপকূলীয় এলাকার ছয়, নদীমাতৃক এলাকার নয় এবং সমতল এলাকায় চ্যাঞ্জের মুখে রয়েছে ৯ শতাংশ স্কুল। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদফতরে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের স্কুলভিত্তিক সর্বশেষ স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। দেশে ভাল মানের স্কুল বাড়ছে না- শিক্ষাবিদদের এমন উদ্বেগের মধ্যেই সরকারের মূল্যায়নে এ তথ্য বেরিয়ে এলো। মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) এক কর্মশালার মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্বল ও অকার্যকর বিদ্যালয়ে ঠিকমতো পাঠদান হয় না। শিক্ষার পরিবেশও ভাল নেই, পরীক্ষার ফলও ভাল হয় না। শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এ ধরনের মূল্যায়ন হয়। কিন্তু ওই সব দেশের বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকেরা অনেক দায়িত্বশীল। তারা তথ্য গোপন করেন না। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও আশা করতে পারব না যে প্রধান শিক্ষকেরা তথ্য গোপন করবেন না। এটা এখনও দুরাশা। তাই

(২ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

ভাল স্কুলের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বাস্তব চিত্র আরও খারাপ হতে পারে।

জানা গেছে, মোট সাত সূচক ও ৪৫টি সহ-সূচকের ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন করা হয়েছে। সাত সূচক হলো– শিখন ও শেখানোর পরিবেশ, প্রতিষ্ঠান প্রধানের নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকারিতা, শিক্ষকদের পেশাদারত্ব, শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব, সহশিক্ষাক্রমিক কর্মসূচী এবং শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক। এই সূচকগুলো কেমন অবস্থায় আছে, তা প্রধান শিক্ষকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। এর ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলোকে 'এ' (অতি উত্তম), 'বি' (ভাল), 'সি' (মধ্যম), 'ডি' (দুর্বল) ও 'ই' (অকার্যকর) এই পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। জানতে চাইলে মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মাউশির পরিচালক (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর হোসেন জনকণ্ঠকে বলেন, মূল্যায়নের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলো আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে। এর ভিত্তিতে কোথায় কোথায় সমস্যা আছে, তা চিহ্নিত হয় এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া যায়। তিনি বলেন, আমাদের এ রিপোর্ট আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এটা নির্দিধায় বলতে পারি। যে কোন বিচারে এ রিপোর্ট মানসম্পন্ন। ইতোমধ্যেই এর প্রমাণও আমরা পেয়েছি। আন্তর্জাতিক একাধিক গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার প্রতিবেদনেও আমাদের রিপোর্টের ফলাফলের সঙ্গে মিলেছে।

স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি তৈরি করতে দেশের সব মাধ্যমিক স্কুলে জরিপ পরিচালনা করা হয়। স্কুলের মোট সংখ্যা ১৮ হাজার ৩৮৫। 'গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করতে সব স্কুলেই একটি ফরম পাঠানো হয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ এই ফরমে তথ্য পাঠান। এরপর উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসে যাচাই শেষে তা অধিদফতরে আসে। এরপর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ প্রতিবেদন তৈরি করে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশে ভাল স্কুলের সংখ্যা সামান্য বেড়েছে। এক বছর আগে 'এ' ক্যাটাগরির এই স্কুলের সংখ্যা ছিল পাঁচ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এখন সেই স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত দশমিক ৩২ শতাংশ।

এক বছর আগে 'বি' ক্যাটাগরির স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪৯ দশমিক ৩৮ শতাংশ, এখন তা বেড়ে হয়েছে ৪৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এক বছর আগে 'সি' ক্যাটাগরির স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৯ দশমিক ৭২ শতাংশ, এখন তা কমে হয়েছে ৩৪ দশমিক ৬৯ শতাংশ। এক বছর আগে 'ডি' ক্যাটাগরির স্কুলের সংখ্যা ছিল পাঁচ দশমিক ১৯ শতাংশ, এখন আছে সাত দশমিক ৮৩ শতাংশ। আর সর্বশেষ 'ই' ক্যাটাগরির স্কুলের সংখ্যা আগে ছিল শূন্য দশমিক ৭১ শতাংশ, এখন তা কমে হয়েছে শূন্য দশমিক তিন শতাংশ। নিচের ক্যাটাগরিতে স্কুলের সংখ্যা কমেছে। তবে 'এ' ও 'বি' ক্যাটাগরিতে সংখ্যা সামান্য হলেও বাড়ছে।

মাউশির পাঠানো নির্দেশ ও প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে স্কুলগুলোকে পাঁচ ক্যাটাগরিতে ভর্তি করা হয়। সেগুলো হচ্ছে– ৯০ শতাংশের উপর যারা নম্বর পেয়েছে তা 'এ' ক্যাটাগরি, ৮০ থেকে ৮৯.৯ শতাংশ নম্বর পেলে 'বি' ক্যাটাগরি, ৭০ থেকে ৭৯.৯ শতাংশ নম্বর পেলে 'সি' ক্যাটাগরি, ৫০ থেকে ৬৯.৯ শতাংশ নম্বর পেলে 'ডি' ক্যাটাগরি এবং ৪৯.৯ শতাংশ নম্বর পাওয়া স্কুলগুলোকে দেয়া হয়েছে 'ই' ক্যাটাগরি। 'এ' ক্যাটাগরির স্কুলের সংখ্যা এক হাজার ৩৪৫, 'বি' ক্যাটাগরিতে নয় হাজার ১৬৭, 'সি' ক্যাটাগরিতে ছয় হাজার ৩৭৮, 'ডি' ক্যাটাগরিতে এক হাজার ৪৪০ ও 'ই' ক্যাটাগরিতে রয়েছে ৫৫ স্কুল।

প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, মোটামুটি ক্লাসরুম সুবিধা রয়েছে ৭৩ শতাংশ স্কুলে, বাকি ২৬ দশমিক ৯১ শতাংশ স্কুলে তা যথাযথ নয়। প্রতি সেকশনে যথার্থ শিক্ষার্থীর সংখ্যা রয়েছে ৭২ দশমিক ৭৬ শতাংশ স্কুলে। নিরাপদ পানির ব্যবস্থা আছে ৮৯ দশমিক ১৪ শতাংশ স্কুলে, শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য ফার্নিচার আছে ৬৭ দশমিক ৯২ শতাংশ স্কুলে, লাইব্রেরি সুবিধা আছে ৭৭ দশমিক ৫ শতাংশ স্কুলে, শিক্ষকদের ভালভাবে বসার ব্যবস্থা রয়েছে ৭৭ দশমিক ৩৭ শতাংশ স্কুলে এবং টয়লেট আছে ৯৭ দশমিক ৭৬ শতাংশ স্কুলে। প্রায় ৯০ শতাংশ প্রধান শিক্ষক তাদের পরিকল্পনা, স্টাফ মিটিংসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে শিক্ষকদের 'এসিআর (বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন)' লিখতে পারে মাত্র ৪০ দশমিক ২৭ শতাংশ প্রধান শিক্ষক।

৮৩ দশমিক ২৪ শতাংশ প্রধান শিক্ষক শিখন ও শেখানো নিশ্চিত করতে পারছে। প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে পেশাদারিত্ব মনোভাব আছে ৮৯ দশমিক ৪৮ শতাংশের। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি তাদের দায়িত্ব পালন করছে ৮৭ দশমিক ৭৩ শতাংশ স্কুলে। ৯২ দশমিক ৭ শতাংশ স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি বাজেট প্রণয়নে মিটিং করে। একটি বিদ্যালয়ে মূল ভূমিকা পালন করে সহকারী শিক্ষকরা। শিক্ষার্থীদের শেখানোর ক্ষেত্রে তারা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। ৮২ দশমিক ২৩ শতাংশ শিক্ষক লিখিতভাবে শেখানোর পরিকল্পনা করে। আর ৯২ দশমিক ১৫ শতাংশ শিক্ষক তাদের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত রেকর্ড রাখে। বছরে ৮০ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত থাকে ৯৬ দশমিক ১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী। পাঠ্যবহির্ভূত অন্যান্য শিক্ষা পরিচালনা করে ৯৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ শিক্ষার্থী।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে সরকারী স্কুল ৩২১ ও বেসরকারী স্কুল ১৮ হাজার ৬৪। সরকারী স্কুলের মধ্যে ৯৯ শতাংশই আশাপ্রদ। আর বেসরকারী স্কুলগুলোর মধ্যে সেই সংখ্যা ৯০ দশমিক ১৬ শতাংশ। মেয়েদের স্কুলের চেয়ে ছেলেদের স্কুলই বেশি ভাল করছে। গার্লস স্কুলের ৮৯ দশমিক ৩ শতাংশ আশাপ্রদ ও ছেলের স্কুলের ক্ষেত্রে সেই সংখ্যা প্রায় ৯৬ শতাংশ।

সমতল এলাকায় অবস্থিত ৯০ দশমিক ৭২ শতাংশ স্কুল, পাহাড়ী এলাকায় এক দশমিক ৩২ শতাংশ, হাওড়ে এক দশমিক সাত শতাংশ, উপকূলীয় এলাকায় দুই শতাংশ ও নদীমাতৃক এলাকায় চার দশমিক ২৬ শতাংশ স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়ী এলাকার সাত দশমিক চার শতাংশ স্কুল চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। এছাড়া হাওড় এলাকার পাঁচ দশমিক ১৩ শতাংশ, উপকূলীয় এলাকার ছয় শতাংশ, নদীমাতৃক এলাকার ৯ শতাংশ এবং সমতল এলাকার ৯ শতাংশ চ্যাঞ্জের মুখে রয়েছে।

স্কুলগুলোর বিভাগভিত্তিক পারফর্মেন্সে দেখা যায়, সবচেয়ে ভাল করছে কুমিল্লা বিভাগ, দ্বিতীয় খুলনা, তৃতীয় চট্টগ্রাম, চতুর্থ ঢাকা, পঞ্চম রাজশাহী, ষষ্ঠ সিলেট, সপ্তম ময়মনসিংহ, অষ্টম বরিশাল ও নবম স্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ। প্রতিবেদনের সুপারিশ করা হয়েছে, বরিশাল ও রংপুর বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

একই সঙ্গে 'ডি' ও 'ই' ক্যাটাগরির স্কুলগুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভাল এবং খারাপ পারফর্মিং স্কুলগুলোর মধ্যে একাডেমিক এক্সচেঞ্জ ভিজিটের ব্যবস্থা করতে হবে। নায়েম, এনসিটিবি ও মাউশি অধিদফতরের মধ্যে যথাযথ কোঅর্ডিনেশন থাকতে হবে। মাঠপর্যায়ের সুপারিভিশন ও মনিটরিং আরও জোরদার করতে হবে।

সৃজনশীল বোঝেন না ৫৪ ভাগ শিক্ষকই ॥ নানা সীমাবদ্ধতার কারণে সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের উদ্বেগ ছিল সব সময়েই। শিক্ষার্থীরা বিষয়টি আয়ত্ত করতে পারছে না বলে সমালোচনাও হচ্ছে। তবে সরকারের গবেষণা প্রতিবেদনই বলছে, কেবল শিক্ষার্থীরই নয় বরং মাধ্যমিক স্কুলের ৫৪ শতাংশ শিক্ষকই এখনও সৃজনশীল পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেননি। এদের মধ্যে প্রায় ২২ শতাংশ শিক্ষকের অবস্থা খুবই নাজুক। এ ধরনের শিক্ষকরা নতুন পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্রও তৈরি করতে পারেন না। বাকিরা এ সম্পর্কে যে ধারণা রাখেন, তা দিয়ে আংশিক প্রশ্নপত্র তৈরি করা সম্ভব নয়। মাউশির সর্বশেষ 'একাডেমিক তদারকি প্রতিবেদনে' এ তথ্য উঠে এসেছে। সৃজনশীল পদ্ধতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রতিবেদনটি। মাউশির মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন ইউনিট প্রতিবেদনটি তৈরি করে।

২০০৮ সালে দেশে মাধ্যমিক স্তরে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়। এ লক্ষ্যে ২০০৭ সালের ১৮ জুন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। ২০১০ সালে বাংলা এবং ধর্ম বিষয়ে এ পদ্ধতিতে প্রথম এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হয়। কিন্তু নতুন এ পদ্ধতি প্রবর্তনের আট বছর পেরিয়ে গেলেও শিক্ষকরা এখন পর্যন্ত তা আয়ত্ত করতে পারেননি। এমন পরিস্থিতির কারণে গত বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে বলা হয়েছে, সৃজনশীলে প্রশ্ন করতে না পারলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও কেড়ে নেয়া হবে।

সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নের এমন করুণ চিত্র সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষকরা বলছেন, মূল সমস্যা প্রশিক্ষণের ঘাটতি। সরকার থেকে এ বিষয়ে সব শিক্ষককে এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। যে ক'জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাও পর্যাপ্ত নয়। মাত্র তিনদিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমদিন ও শেষদিন আসা-যাওয়ার মধ্যে কেটেছে। সেই হিসেবে প্রশিক্ষণ হয়েছে মাত্র একদিন। সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য যে কটি উদ্দেশ্য মোটা দাগে প্রচার করা হয় তার অন্যতম হচ্ছে শিক্ষার্থীদের গাইড বই ও কোচিং-নির্ভরতা কমানো। কিন্তু বর্তমানে কেবল শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষকরাও গাইড নির্ভর হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি খোদ পাবলিক পরীক্ষায় হুবহু গাইড বই থেকে প্রশ্ন করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে ধরা পড়েছেন ৫ শিক্ষক। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে।

দক্ষতায় পিছিয়ে ১৯ শতাংশ শিক্ষার্থী ॥ বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণীর ১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী দক্ষতায় এগিয়ে থাকলেও পিছিয়ে রয়েছে ১৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। মাউশির প্রতিবেদনে দেখা যায়, দক্ষতা অর্জনে মধ্যম অবস্থায় রয়েছে ৬৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। তবে শহরের তুলনায় গ্রামের শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে আগের চেয়ে বেশি দক্ষতা অর্জন করেছে। প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, দেশের ৩২ জেলার ৫৫ উপজেলার ৫২৭ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ শ্রেণীর ১৫ হাজার ৮১০ ও অষ্টম শ্রেণীর ১৫ হাজার ৮১০ শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের দক্ষতার মান যাচাইয়ের জন্য বাংলা, গণিত এবং ইংরেজী বিষয়কে বেছে নেয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অনেক নিচে অবস্থান করছে ২৩ শতাংশ, ৫৭ শতাংশ শিক্ষার্থী মধ্যম অবস্থায় এবং অধিক দক্ষতা অর্জন করেছে ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী। ইংরেজীতে ২৯ শতাংশ অনেক কম দক্ষতা অর্জন করেছে, ৫৬ শতাংশ মধ্যম এবং ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী অধিক দক্ষতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে বাংলায় ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী অনেক কম দক্ষতা অর্জন করেছে, ৬০ শতাংশ মধ্যম এবং মাত্র ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী অধিক দক্ষতা অর্জন করেছে।

ছাত্র এবং ছাত্রীর মধ্যে কে কোন বিষয়ে দক্ষতায় এগিয়ে ও পিছিয়ে রয়েছে তাও এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতে ৮০ শতাংশ ছাত্র এবং ৭৫ শতাংশ ছাত্রী গড় শিখন মান অর্জন করেছে। ইংরেজীতে ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়ই সমান ৭১ শতাংশ দক্ষতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে বাংলায় ৬৮ শতাংশ ছাত্র এবং ৭০ শতাংশ ছাত্রী দক্ষতা অর্জন করেছে। আবার অষ্টম শ্রেণীর গণিতে ৬২ শতাংশ ছাত্র এবং ৫২ শতাংশ ছাত্রী, ইংরেজীতে ৫০ শতাংশ ছাত্র, ৪৯ শতাংশ ছাত্রী এবং বাংলায় ৫৫ শতাংশ ছাত্র এবং ৫৪ শতাংশ ছাত্রী গড় শিখন মান অর্জন করেছে।